পুণ্যপদপরশে

শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহে বিকশিত হীরানন্দ

রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি জগন্মাতার 'বালক', যাঁর পরনের কাপড় ঠিক থাকে না—মাঝে মাঝেই চলে যায় বগলে, তিনি ২৩ এপ্রিল ১৮৮৬ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একজনকে বলছেন : ''তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও।''[১] এর কারণ, সেই 'একজন' তাঁকে বলেছেন যে তাঁদের দেশের পাজামা পরলে তিনি আরামে থাকবেন। পাজামা পরার সুযোগ শ্রীরামকৃষ্ণের হয়নি, কারণ এই ঘটনার চার মাসের মধ্যেই ১৬ আগস্ট মর্ত্যলোকের লীলা শেষ করে তিনি অপ্রকট হন। আমরা স্মরণ করব শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য সেই 'একজন'কে যাঁর নাম হীরানন্দ শৌকিরাম আদবানি। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, নিজ নিজ সংস্কার দ্বারা চালিত হলেও তাঁদের জীবন উচ্চতর স্তরে বিকশিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণেরই স্নেহে ও কৃপায়। হীরানন্দ ছিলেন এমনই একজন।

মাত্র তিরিশ বছর জীবিত ছিলেন হীরানন্দ। স্বামীজীর সমবয়সি তিনি ২৩ মার্চ ১৮৬৩ হায়দ্রাবাদ সিন্ধ-এ (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত) এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঠাকুরদা দেওয়ান শৌকিরাম নন্দীরাম ছিলেন তালুকের রেভিনিউ অফিসার এবং ম্যাজিস্ট্রেট। বাল্যবয়সে প্রথমে বড়ভাই নবলরাই-এর (প্রায় চোদ্দো বছরের বড়) দ্বারা হীরানন্দ প্রভাবিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারের ঢেউ তখন বাংলা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। কেশবচন্দ্র সেন তখন খুবই পরিচিত নাম। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট নবলরাই ১৮৭৩ সালে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সমাজসংস্কারের সদিচ্ছায় তিনি লিপ্ত হন নানা জনকল্যাণমূলক কাজে। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই সি এস—যখন ১৮৭৫ সালে সিন্ধের জেলা জজ নিযুক্ত হন, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সেখানে বেশ জোরালো। সিন্ধের সমাজে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট নবলরাই ব্রাহ্ম নববিধান মন্দির স্থাপন করে সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে উদ্‌ঘাটন করান।

ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ নবলরাই এবার ভাই হীরানন্দের সুশিক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠান। ১৮৭৯ সালে হীরানন্দ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রথম দিকে তিনি মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় ৬ নং কলেজ স্কোয়ার,

'ভারত আশ্রমে' থাকতে শুরু করেন এবং পরে কেশবচন্দ্রের পরিবারে তাঁদেরই একজন সদস্যের স্থান লাভ করে তাঁদের কলুটোলার বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। হীরানন্দ কেশবচন্দ্রকে 'মেজকাকা' ও তাঁর ভাই কৃষ্ণবিহারীকে 'ছোটকাকা' বলে ডাকতেন এবং তাঁদের ভগিনীকে 'বড়পিসি' সম্বোধন করতেন।[২] ইতিমধ্যে হীরানন্দের ভাই মোতিরামও কলকাতায় লেখাপড়া করতে এসে কেশবের পরিবারভুক্ত হয়ে যান।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতার কথা সকলেরই জানা। কেশব যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের টানে তাঁর কাছে আসতেন, তেমনি তিনিও কেশবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হতেন। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে হীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন এবং কলেজে পড়তে পড়তেই তাঁর দর্শন লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, ঈশ্বরতন্ময়তা, ঘন ঘন সমাধি—এইসব তাঁকে এমনই আকৃষ্ট করে যে তিনি বারবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'নালু' (প্রমথলাল সেন) লিখেছেন, দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতকারী যুবকদের মধ্যে হীরানন্দকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সব থেকে বেশি স্নেহ করতেন। হীরানন্দ তাঁর পদপ্রান্তে বসে শুনতেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা, তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিচার চালাতেন, মজা করতেন এবং তাঁর সেবাও করতেন। মাঝে মাঝে রাতে দক্ষিণেশ্বরে থেকেও যেতেন তিনি। ওইসময়েই একদিন (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলেন : ''নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর। আর হীরানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তার ভাবটি কেমন মধুর।''[৩] আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তরুণ হীরানন্দ তাঁর স্বভাবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মনে প্রথম থেকেই জায়গা করে নিয়েছিলেন।

খুব কম বয়সেই পারিবারিক চাপে হীরানন্দকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু বিবাহ তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানস্পৃহার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্যও এখানে স্মরণীয় : ''যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তাহলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশি আসক্ত হবে না।''[৪]

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করার সময় হীরানন্দ বিভিন্ন খেলাধূলায় (ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাসটিকস্) অংশগ্রহণ করতেন। আলিপুরে এক দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি কুচবিহারের মহারাজাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেশে ফিরে যান এবং সিন্ধ সমাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই ব্যাপারে নবলরাই-এর সহযোগিতা ও পথনির্দেশও তিনি পান। করাচি থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকার (সিন্ধিভাষায় 'Sindhu Sudhar' ও ইংরেজিতে 'Sindh Times') সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তিনি। ১৮৮৮ সালে নবলরাই-এর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে 'Union Academy' নামে বিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন। একইসঙ্গে চলতে থাকে সাংবাদিকতার কাজ। কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য তিনি করাচিতে একটি কেন্দ্র খোলেন।

এতসব কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেও কখনই হীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতার খবর পেয়ে ছোটভাই মোতিরামকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তিনি লেখেন : ''I am extremely sorry to learn that Paramahansa is in such a critical state...The ill news is weighing very heavily upon me.''[৫] (পরমহংসদেবের এমন সংকটজনক অবস্থার খবর জেনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।... অসুখের খবরটা আমাকে খুবই

ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে।) সময় নষ্ট না করে আড়াই হাজার মাইল দূর থেকে তিনি এপ্রিল মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে কলকাতায় চলে আসেন।

এই সময়ে একদিন (২২ এপ্রিল ১৮৮৬) কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, হীরানন্দ ও নরেন্দ্রনাথের আলাপচারিতার বিবরণ আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থে পাই। ওপরের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ রয়েছেন। উপস্থিত শ্রীমও। একটু পরে নরেন্দ্রনাথ এলে ঠাকুর বললেন : ''একটু দুজনে কথা কও।'' ভক্তেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলবেন এবং তিনি তা শুনতে শুনতে মাঝে মধ্যে কিছু মন্তব্য করবেন—এটা তো ঠাকুরের লীলাবিলাসের একরকম প্রকাশ! হীরানন্দ নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন : ''আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন?'' শ্রীম লিখছেন, হীরানন্দের 'মধুর ন্যায় মিষ্ট' কথাগুলি শুনে সবাই বুঝতে পারলেন যে 'এঁর হৃদয় প্রেমপূর্ণ'। ঠাকুরের 'খাপখোলা তরোয়াল' নরেন্দ্রের উত্তর : ''The scheme of the universe is devilish! I could have created a better world!'' (এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম।)

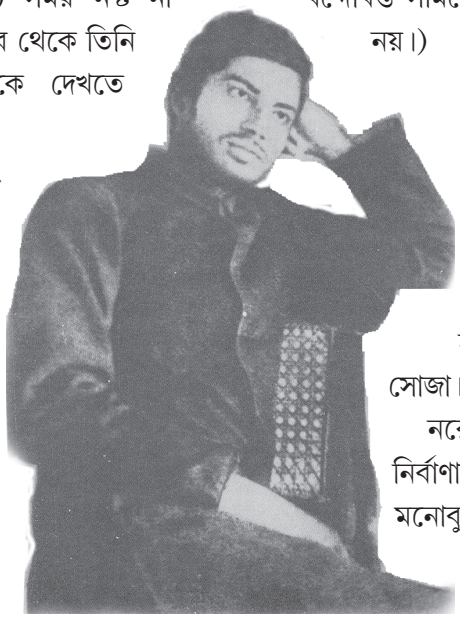

হীরানন্দ শৌকিরাম আদবানি

হীরানন্দ—দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?

নরেন্দ্র—I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme. (জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি—যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়।)

''তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। Our only refuge is in pantheism : সবই ঈশ্বর,—এই বিশ্বাস হলেই চুকে যায়! আমিই সব করছি।''

হীরানন্দ—ও-কথা বলা সোজা।

নরেন্দ্রনাথ এবার সুর করে নির্বাণাষ্টক বলতে লাগলেন : ''ওঁ মনোবুদ্ধ্য- হঙ্কারচিত্তানি নাহং... শিবোঽহং শিবোঽহম্।'' সব শুনে হীরানন্দের ছোট্ট একটি কথা—'বেশ'।

'নাটের গুরু' শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে ইশারায় জবাব দিতে বললেন।

হীরানন্দ বললেন : ''এককোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি, সোঽহম্—তাতেও ঈশ্বরানুভব। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়।''

হীরানন্দ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত ভাবেরই একটিকে ব্যক্ত করলেন। সবাই চুপ করে আছেন। হীরানন্দের অনুরোধে নরেন্দ্র এবার গাইলেন 'কৌপীনপঞ্চকম্'। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে গাইলেন : ''তুঝসে হামনে দিলকো লগায়া, যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়...'' ইত্যাদি। নরেন্দ্রের গান, শ্লোক আবৃত্তি শেষ হলে সবাই যখন নীরব, হীরানন্দ ও নরেন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুরের দুটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নরেন্দ্র ''যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্চে'' আর হীরানন্দ, ''কি শান্ত! রোজার

কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে!''[৬] ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না যে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে 'রোজা' এবং হীরানন্দ 'জাতসাপ'—যে নিজ সিদ্ধান্তে নির্মমভাবে স্থির ও কঠোর।

স্বল্পায়ু হীরানন্দ (১৮৬৩—১৮৯৩) তাঁর জীবনের শেষ নয়-দশ বছর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পরার্থে যেসব কাজ করে গেছেন সেসব ভাবলে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মর্মার্থ বুঝতে পারা যায়। বিভিন্নভাবে মানুষের সেবা করা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট হীরানন্দ চাইতেন দেশের মানুষ যেন দেশ ও সমাজকে ভালবাসে। তাঁর ছোট ভাই মোতিরাম যখন আইন পড়তে ইংল্যান্ডে যান, চিঠি লিখে তাঁকেও প্রেরণা জোগাতেন তিনি। ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৯ মোতিরামকে লেখা তাঁর চিঠির কিছু অংশ এইরকম : ''...It is unmistakably a very fond and dear desire of my heart that your training in England should so refine your tastes and elevate your aims and aspirations as to make you an earnest patriot and philanthropist.''[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন মানুষ 'মান-হুঁশ'-এ রূপান্তরিত হোক। হীরানন্দের মধ্যে এই 'হুঁশ'-এর বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের দুঃখকষ্টে তাঁর হৃদয় মথিত হত। একদিন তিনি ঠাকুরকেও তাঁর কষ্ট দেখে প্রশ্ন করেছিলেন : ''আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়?'' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : ''দেহের কষ্ট।'' তিনি হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন : ''বুঝতে পারলে?'' উপস্থিত শ্রীম হীরানন্দকে বুঝিয়ে দেন : ''লোকশিক্ষার জন্য। নজির। এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আনা যোগ!'' হীরানন্দ সায় দিয়ে বলেন : ''হাঁ, যেমন Christ-এর Crucifixion.''

এই ঘটনার পরদিনও (এপ্রিল ২৩, ১৮৮৬) হীরানন্দ কাশীপুরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে তাঁকে প্রবোধ দেন : ''তা অত ভাবেন কেন? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই নিশ্চিন্ত। আপনি তো বালক।'' শ্রীম হীরানন্দকে বুঝিয়ে বলেন : ''উনি আপনার (নিজের) জন্য ভাবছেন না। ওঁর শরীররক্ষা ভক্তের জন্য।''[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে মানবদরদি হীরানন্দের মনে এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে মানুষের জীবন পরার্থে। তাঁর লেখা অনেক চিঠিতেই এই ভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর বিভিন্ন কাজের মধ্যেও ছিল এর প্রকাশ।

সরলপ্রকৃতির হীরানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কতটা স্নেহ করতেন তার পরিচয় আমরা পাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে। এপ্রিল ২৩, ১৮৮৬ কাশীপুরে হীরানন্দ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। ঠাকুর জানতে পারেন যে ভাত ভাল সিদ্ধ হয়নি। হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয়নি ভেবে তিনি বারবার বলছেন, ''জলখাবার খাবে?'' এই সাক্ষাৎকারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একাধিকবার বলেছিলেন, ''সেখানে নাই বা গেলে?'' তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, ''কি মাহিনা পাও?'' হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল হীরানন্দকে তাঁর কাছে রেখে আরও বিত্তশালী করতে, যে-বিত্তে অধ্যাত্মরাজ্যের রাজরাজেশ্বর হওয়া যায়। সেদিন কাশীপুর থেকে হীরানন্দ চলে যাওয়ার পর ঠাকুর শ্রীম'কে বলছেন, ''বড় ইচ্ছা (হীরানন্দের), আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়।''[৯] সেটা সম্ভব না হলেও হীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাব' অন্তরে সর্বদা ধারণ করতেন এবং বহন করেও নিয়ে যান তাঁর দেশ সিন্ধ-এ।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের সংবাদ যদিও হীরানন্দকে খুবই বিচলিত করে, তবু তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৮৭ সালে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজও ছেড়ে দেন।

হীরানন্দ তাঁর দুই কন্যা লক্ষ্মী এবং রানিকে সুশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিহারের বাঁকিপুরে 'অঘোরকামিনী বালিকা বিদ্যালয়ে' (প্রসঙ্গত অঘোরকামিনী দেবী ছিলেন বিখ্যাত জননায়ক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা) ভর্তি করার জন্য জুন, ১৮৯৩ যাত্রা করেন। পথে সুক্কুর, লাহোর ও লক্ষ্ণৌতে থামেন, যেখানে তাঁর ছোট মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেবাযত্নে তাকে সুস্থ করে তুলে হীরানন্দ নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তবুও তিনি বাঁকিপুরে আসেন। ১৪ জুলাই জ্বর আরও বেড়ে যায় এবং সেদিনই হীরানন্দ মর্ত্যধাম ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

হীরানন্দের মৃত্যুতে সিন্ধ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। এক ব্রাহ্মভক্ত বলেন : 'He was not Hiranand but Hari Anand, the Delight of God.'[১০] (সে হীরানন্দ ছিল না, ছিল হরি আনন্দ—ঈশ্বরের আনন্দ)। এটি খুবই সার্থক উক্তি। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে দেখে পরম আনন্দ অনুভব করতেন। সেই কারণেই বোধহয় নিজের লীলাসংবরণের সাত বছরের মধ্যে তাঁর প্রিয় হীরানন্দকে নিয়ে আনন্দ করবেন বলে অনন্তধামে তাঁকে টেনে নিলেন।

তথ্যসূত্র

১। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৪), পৃঃ ১০৫৭ [এরপর *কথামৃত*]

২। Compiled by C.T. Valecha, *Sadhu Hiranand,* (Centenary Celebration Committee : Bombay, 1963), p.34

৩। *কথামৃত*, পৃঃ ৩১৮

৪। *তদেব*, পৃঃ ৬১৩

৫। *Sadhu Hiranand,* p.42

৬। *দ্রঃ কথামৃত*, পৃঃ ১০৫২-১০৫৫

৭। *Sadhu Hiranand,* p.58

৮। *দ্রঃ কথামৃত*, পৃঃ ১০৫৬-৫৭

৯। *দ্রঃ তদেব*, পৃঃ ১০৫৭-১০৫৯

১০। *Sadhu Hiranand,* p.64

সহায়ক গ্রন্থ

১। Ajmal Kamal, Article published in the *Journal of Pakistan Historical Society*, Vol. 62, No 1, Jan-Mar 2014

২। Swami Prabhananda, *First Meetings with Sri Ramakrishna*, (Ramakrishna Math, Mylapore, Madras)

উপনিষদের অমৃত

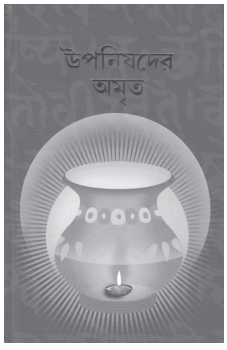

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদের শাশ্বত ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। তাঁরই চিন্তাধারার অনুবর্তনে নিবোধত পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপনিষদীয় আলোচনার সূত্রপাত। 'উপনিষদের অমৃত' নামে দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই মনোজ্ঞ উপনিষদচিন্তন বহুজনের অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবোধত পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য এই গ্রন্থটি শাস্ত্রামোদী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। মূল্য ১৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।